সাম্যবাদ

‘বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)’-এর মুখপত্র

১৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা, মার্চ-২০২৬ | website: www.spbm.org, E-mail: mail@spbm.org | মূল্য ৫ টাকা

গণঅভ্যুত্থান থেকে নির্বাচন: গণআকাঙ্খা পূরণ হবে কি?

গত ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দীর্ঘ ১৭ বছর দেশের জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান বাতিল করে সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক-অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা দখল করে রেখেছিল। পুলিশ ও প্রশাসনকে ব্যবহার করে একতরফা নির্বাচন, রাতের ভোট, ডামি নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে গণঅভ্যুত্থানের মুখে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয় এবং দেড় সহস্রাধিক মানুষের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে অন্তবর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে।

বিগত দেড় বছরের বেশি সময় অন্তবর্তী সরকার ক্ষমতায় থাকলেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল করতে পারেনি। দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজারে হামলা, প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে আগুন দেয়াসহ ‘মব সন্ত্রাস’ জনজীবন ত্রস্ত্র করে রেখেছিল। এসব ঘটনায় সরকারের দৃশ্যমান তৎপরতা ছিল না। ফলে একটা আশঙ্কা ছিল যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সংসদ নির্বাচন কতটা সুষ্ঠুভাবে করতে পারবে। কিছু জায়গায় জাল ভোট, কেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা, হামলা-পাল্টা হামলা, পোলিং এজেন্ট বের করে দেয়ার ঘটনা ঘটলেও সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজয়ী ও পরাজিত সকল দলই রায় মেনে নিয়েছেন।

গণঅভ্যুত্থানে শুধু শেখ হাসিনা সরকারের পতন

চট্টগ্রাম-১০ আসনে নির্বাচনী জনসভা

নয়, রাষ্ট্রের সংস্কারেও জনগণের আকাঙ্খা ছিল প্রবল। সংস্কার কার্যক্রমে অন্তবর্তী সরকার সঠিক প্রক্রিয়া অবলম্বন না করে সাংবিধানিক সংস্কার প্রশ্নে গণভোটের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে এবার একইসাথে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নির্বাচনে সকল দল সমান সুযোগ পাবে, টাকা-মিডিয়া-পেশীশক্তির দাপট কমবে - অভ্যুত্থান পরবর্তীকালে এটাই প্রত্যাশা ছিল। সেটা আমরা দেখতে পেলাম কি? বাস্তবে প্রচার মাধ্যম, বিপুল টাকা, ধর্ম ও পেশিশক্তি ব্যবহার করে দেশের জনগণকে দুই মেরুতে ঠেলে দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে কোনো না কোনো পুঁজিপতিদের দলকে সমর্থন করতে বাধ্য করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় বিএনপি প্রায় দুই তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে সরকার গঠন করে।

বিগত নির্বাচন কেমন ছিল

বিগত আওয়ামী লীগ সরকার দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিল। জাতীয় নির্বাচন থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকার নির্বাচন পর্যন্ত-সবগুলোর ফলাফলই তাদের ইচ্ছা অনুসারে হতো। ফলে অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতো দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের দাবিও ছিল দীর্ঘদিনের। অন্তবর্তী সরকার ‘নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন’ গঠন করেছিল। কিন্তু সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সংস্কার সম্পন্ন করেনি। উল্টো নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে জামানতের বিধান ২০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করা হয়। ফলে প্রথমত,

● এরপর ২য় পৃষ্ঠায়

ব্যবস্থা বদলের বার্তা নিয়ে

বাসদ (মার্কসবাদী)-র নির্বাচনে অংশগ্রহণ

নির্বাচন পরবর্তীতে কুড়িগ্রাম জেলার রাজিবপুরে এক বৃদ্ধ, বাসদ (মার্কসবাদী) প্রার্থী রাজু আহমেদকে জড়িয়ে ধরে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলছিলেন- ‘আমার জীবনে এই প্রথম দেখলাম ভোটে হেরে গিয়ে কোন প্রার্থী ভোটারদের ধন্যবাদ জানাতে এসেছে। আপনারা কথা দিয়েছিলেন ভোট শেষে আসবেন, আবার এসেছেন, আমি অভিভূত।’ একইরকম অভিজ্ঞতা বাসদ (মার্কসবাদী) দলের অন্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও হয়েছে। দলের প্রার্থী ও নেতাকর্মীরা নির্বাচনের দুইদিন পর থেকেই আবারও ভোটারসহ সাধারণ মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়েছে। নির্বাচনে সাধারণ মানুষ দলকে বিভিন্নভাবে যে সহযোগিতা করেছে সেজন্য ধন্যবাদ জানিয়ে লিফলেট বিতরণ করেছে। দলের এধরনের উদ্যোগকে ব্যতিক্রমী সংস্কৃতি বলে সাধুবাদ জানিয়েছে মানুষ।

নির্বাচনের সময় মানুষের মাঝে বিপ্লবী রাজনীতি ও সংস্কৃতি প্রচারের লক্ষ্য নিয়ে বাসদ (মার্কসবাদী) দল কাঁচি প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এবারের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে সাধারণ মানুষের বিশেষ আগ্রহ ছিল। কারণ গত তিনটি জাতীয় নির্বাচনে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছিল আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে বহু প্রাণের বিনিময়ে জনগণ ভোটাধিকার ফিরে পেয়েছে। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে শুধু ভোটাধিকার নয় মানুষের রাষ্ট্র সম্পর্কিত চিন্তাতেও পরিবর্তন

● এরপর ৩য় পৃষ্ঠায়

শুধু ক্ষমতার পালাবদল নয়

ফ্যাসিবাদের বিলোপ ও বৈষম্যহীন সমাজের জন্য চাই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন

আওয়ামী লীগের ভয়াবহ ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটালো রক্তস্নাত জুলাই গণঅভ্যুত্থান। প্রায় দেড় হাজারের অধিক মানুষের প্রাণের বিনিময়ে এই গণঅভ্যুত্থান বিজয়ী হয়েছে। প্রায় ২৫ হাজার লোক আহত হয়েছেন, ছয়শত লোক তাদের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। আওয়ামী লীগ আমলে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে প্রহসনের তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই নির্বাচনগুলোতে মানুষকে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেয়া হয়নি। একদিকে দেশের জাতীয় সম্পদ ও ব্যাংক লুটপাট, সীমাহীন দুর্নীতি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, জীবন-জীবিকা ধ্বংস, খুন-বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিবাদের ন্যূনতম শক্তিকে স্তব্ধ করে দেয়া; অন্যদিকে মানুষকে তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে তাদের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারকে কেড়ে নেয়া- এর মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। গণঅভ্যুত্থান ছিল এসবের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদ।

সেই ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের পর প্রথম নির্বাচনকে ঘিরে মানুষের মনে যে বিরাট আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ থাকার কথা, সেটা নেই। বরং মানুষের মনে আতঙ্ক বিরাজ করছে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

● এরপর ৫ম পৃষ্ঠায়

সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতি:
ইরানে হামলার প্রকৃত কারণ

ইরানে হামলায় হত্যার শিকার স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য খোঁড়া গণকবর

ইরানের উপর বিনা উস্কানিতে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ও ইসরায়েল হামলা পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে হামলা চালিয়ে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আলী খোমেনিসহ ইরানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়েছে। একটি স্কুলে বোমা মেরে হত্যা করা হয়েছে ১৮০ শিশুকে। আমেরিকার লক্ষ্য ইরানে তাদের অনুগত একটি পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা। সেজন্য সে সমস্ত আন্তর্জাতিক সভ্য রীতিনীতি, জাতিসংঘ সনদ পায়ে মাড়িয়ে একটি স্বাধীন- সার্বভৌম দেশ ইরানের উপর আগ্রাসন নামিয়ে এনেছে।

সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা সারাবিশ্বে আজ নতুন করে যুদ্ধোন্মাদনা তৈরি করেছে। কিছুদিন আগে ভেনেজুয়েলার উপর নগ্ন হামলা, নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নিকোলাই মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করে আমেরিকায় নিয়ে এসে ‘মাদক পাচারের’ মিথ্যা অভিযোগে বিচারের নাটক ও কিউবার উপর আগ্রাসনের ক্রমাগত হুমকির ধারাবাহিকতায় ইরানের উপর এ হামলা করা হলো, যার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বকে নতুন করে ভয়াবহ যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

কেন ইরানের উপর আমেরিকা-ইসরাইলের হামলা?

অনেকেই মনে করেন ইরান বা ফিলিস্তিনের উপর হামলা মুসলিমদের উপর পাশ্চাত্য বা খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর হামলা। যদি তাই হতো তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো আমেরিকার পক্ষে কেন? ফলে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এই হামলার প্রকৃত কারণ উদঘাটন সম্ভব নয়।

● এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়

১ম পৃষ্ঠার পর

গণঅভ্যুত্থান থেকে নির্বাচন:

অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা কারও পক্ষে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়াই কঠিন করে তোলা হয়। দ্বিতীয়ত, নির্বাচন আপেক্ষিকভাবে শান্তিপূর্ণ হলেও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ছিল অসম। এই অসমতা রাষ্ট্রক্ষমতার শ্রেণিগত বিন্যাসের স্বাভাবিক ফল। যে রাজনৈতিক শক্তি রাষ্ট্রযন্ত্র, প্রশাসনিক কাঠামো এবং অর্থনৈতিক প্রভাববলয়ের নিকটবর্তী, তারা নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিকভাবেই অগ্রাধিকার পায়। ফলে নির্বাচন আনুষ্ঠানিকভাবে বহুদলীয় হলেও বাস্তবে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ থাকে প্রভাবশালী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে। অর্থাৎ ভোট হয়েছে, কিন্তু যে কোনো প্রতিযোগিতার যে নীতি 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' – নির্বাচন কমিশন তা নিশ্চিত করতে পারেনি।

তৃতীয়ত, জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভেতরেও একটি অস্বাভাবিক আর্থিক গতিশীলতা লক্ষ্য করা গেছে, যা নির্বাচনী রাজনীতিতে কালোটাকার ব্যবহার নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। নির্বাচন যত ঘনিয়ে এসেছে, ততই ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে নগদ অর্থের প্রবাহ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে যা নির্বাচনী ব্যয়ের বাস্তব চরিত্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দেয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে (ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি) দেশে ব্যাংকের বাইরে থাকা নগদ অর্থ প্রায় ৪১ হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারাও স্বীকার করেছেন যে নির্বাচনী প্রচারণা, কর্মী ব্যবস্থাপনা এবং মাঠপর্যায়ের ব্যয় মেটাতে প্রার্থীদের বড় অংশ নগদ অর্থ উত্তোলন করেছেন, যার ফলে এই অস্বাভাবিক নগদ প্রবাহ তৈরি হয়েছে।

নির্বাচনে পোস্টার, মিছিল, পরিবহন, কর্মী ভাতা, স্থানীয় প্রভাব বিস্তার, জনসংযোগ কিংবা ভোটার ব্যবস্থাপনার বড় অংশই নগদ অর্থের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ফলে আনুষ্ঠানিক হিসাবের বাইরে বিপুল অর্থ নির্বাচনী মাঠে প্রবেশ করে, যার উৎস স্বচ্ছ নয়। অর্থনীতিবিদদের মতে, নির্বাচনের আগে মানুষের হাতে হঠাৎ নগদ অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া সরাসরি নির্বাচনী ব্যয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং এখান থেকেই কালোটাকার ব্যবহারের আশঙ্কা তৈরি হয়।

সর্বশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আবারও দেখিয়েছে যে বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতি ক্রমশ পুঁজিনির্ভর হয়ে উঠছে। নির্বাচনে বিপুল অর্থব্যয়, কালোটাকার ব্যবহার, ধর্মের ব্যবহার এবং স্থানীয় পেশিশক্তির সক্রিয়তা প্রমাণ করে যে বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনীতি আদর্শের নয়, বরং বিনিয়োগের ক্ষেত্র। এখানে প্রার্থী হয়ে ওঠে বিনিয়োগকারী। নির্বাচনে ব্যয় করা অর্থ পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে পুনরুদ্ধারের প্রবণতা তৈরি করে, যা দুর্নীতি ও লুটপাটের কাঠামোগত ভিত্তি শক্তিশালী করে। ফলে সংসদ জনগণের প্রতিনিধিত্ব হারিয়ে ব্যবসায়ী, ঠিকাদার ও ক্ষমতাসংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক শ্রেণির আধিপত্যে চলে যায়।

এই সংসদেও ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিদের আধিপত্য

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান ক্রমশ: ধনী ও ব্যবসায়ী শ্রেণির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত ২৯৭ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ২৭১ জনই কোটিপতি, যা মোট সদস্যের প্রায় ৯১.২৫ শতাংশ। অর্থাৎ জাতীয় সংসদে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ শ্রমিক, কৃষক, নিম্নবিত্ত কিংবা সীমিত আয়ের মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর বাস্তব সামাজিক অবস্থানের প্রতিফলন প্রায় অনুপস্থিত। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, সংসদ সদস্যদের প্রায় অর্ধেকেরই বিপুল অঙ্কের ব্যক্তিগত দায় বা ঋণ রয়েছে, যার মোট পরিমাণ প্রায় ১১ হাজার ৩৬৫ কোটি টাকা। এই বিপুল ঋণনির্ভর সম্পদ রাজনৈতিক ক্ষমতা ও ব্যবসায়িক স্বার্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককেই সামনে নিয়ে আসে। একই সঙ্গে সংসদে সরাসরি গার্মেন্টস শিল্পের অন্তত ১৫ জন মালিকের উপস্থিতি একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে যেখানে শ্রম আইন, ন্যূনতম মজুরি, শ্রমিক নিরাপত্তা কিংবা রপ্তানিমুখী শিল্পনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, সেখানে নীতিনির্ধারক যদি নিজেরাই বড় শিল্পপতি হন, তবে সেই আইন কতটা শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে দাঁড়াবে? বাস্তবতা হলো, যখন রাষ্ট্রক্ষমতা সম্পদশালী গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, তখন নীতি প্রণয়ন জনকল্যাণের পরিবর্তে পুঁজির সুরক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে প্রশ্নটি কেবল ব্যক্তিগত সম্পদের নয়; গণতন্ত্রের চরিত্র সম্পর্কিত। জাতীয় সংসদ কি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করবে, নাকি কোটিপতি ব্যবসায়ী শ্রেণির অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় পরিণত হবে? এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক নয় কি!

বিএনপি-জামায়াতকে কেন্দ্র করে মেরুকরণ

বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ক্ষমতার লড়াই দীর্ঘদিন ধরেই দুটি প্রধান ধারার রাজনৈতিক মেরুকরণের মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে। অতীতে প্রতিটি জাতীয় নির্বাচন আবর্তিত হতো আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সেই পুরোনো মেরুকরণের কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে নতুন এক দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে, যেখানে রাজনৈতিক বিভাজনের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। জামায়াতে ইসলামী একটি কৌশলগত রাজনৈতিক বয়ান সামনে আনে – বিএনপি ক্ষমতায় এলে দেশে পুনরায় চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ও নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষমতাচর্চার বিস্তার ঘটবে। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে এই বক্তব্য সমাজের একটি অংশের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং তারা বিএনপির বিকল্প হিসেবে জামায়াতের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। অর্থাৎ রাজনৈতিক অসন্তোষকে ব্যবহার করে জামায়াত নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা পুনর্গঠনের চেষ্টা চালায়।

কিন্তু এখানেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের গভীরতম দ্বন্দ্বটি প্রকাশ পায়। কারণ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতার বিরোধিতা, গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার ঐতিহাসিক দায় জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফলে সমাজের গণতান্ত্রিক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী ও প্রগতিশীল অংশ জামায়াতের উত্থানকে সম্ভাব্য বিপদ হিসেবে বিবেচনা করে। অতীতে এই ভয় থেকে অনেকে আওয়ামী লীগের দিকে ঝুঁকেছিল। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় আওয়ামী লীগের উপস্থিতি না থাকায় একটা অংশ এবার জামায়াতকে ঠেকানোর যুক্তিতে বিএনপির দিকে অবস্থান নেয়।

ফলে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্র আবারও একটি বিভাজনের মধ্যে আটকে যায় – একদিকে জামায়াতবিরোধী অবস্থান, অন্যদিকে বিএনপিকে নিয়ে আশঙ্কা। জনগণের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আদর্শ, নীতি বা সামাজিক রূপান্তরের প্রশ্নে নয়; বরং আবারো 'মন্দের ভালো' নির্বাচন করার মানসিকতায় নির্ধারিত হতে থাকে। এই পরিস্থিতি গণতন্ত্রকে প্রকৃত অর্থে বিকশিত না করে বরং সংকুচিত করে, কারণ জনগণ ইতিবাচক রাজনৈতিক বিকল্পের বদলে প্রতিরোধমূলক ভোটের রাজনীতিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তির বিকাশ কোনো একক দলের সৃষ্টি নয়। রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীগ যেমন রাজনৈতিক সুবিধাবাদের কারণে বিভিন্ন সময়ে ধর্মভিত্তিক শক্তিকে প্রশ্রয় দিয়েছে, তেমনি বিএনপিও তাদের রাজনৈতিক জোট ও ক্ষমতার কৌশলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে বৈধতা দিয়েছে। ফলে মৌলবাদ কেবল বিরোধী শক্তি হিসেবে নয়, বরং বড় বড় দলগুলোর আশ্রয় প্রশ্রয়েই জায়গা তৈরি করেছে। ধর্মীয় পরিচয়কে রাজনৈতিক সমর্থন ও রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার এই প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদে সমাজের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তিকে দুর্বল করেছে।

গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষ এসব দেখে এক আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। ইতিহাসের শিক্ষা প্রমাণ করে যে, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী লড়াই মানেই কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা কথার যথার্থ অর্থ হচ্ছে রাজনীতি, রাষ্ট্র, শিক্ষা, আইন, কানুন ইত্যাদির সাথে ধর্মের সম্পর্ক থাকবে না। ধর্ম পালনের অধিকার মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ইউরোপের নবজাগরণ থেকে আসা এই চিন্তা আমাদের দেশ এবং উপমহাদেশে চর্চা করা হয়নি। ফলে ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, জাত-পাত এই বিষয়গুলো ধুরন্ধর রাজনৈতিক শক্তির ক্ষমতা লাভের হাতিয়ার হয়ে জনসাধারণের একতাকে ছিন্ন করতে পারছে। সাম্প্রদায়িকতা রুখতে গেলে গরীব-মেহনতি মানুষের উপর নেমে আসা একের পর এক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইকে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আদর্শিক লড়াইয়ের সাথে যুক্ত করতে হবে। জনগণকে সংগঠিত করে ক্রমাগত এই অর্থনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শুধু কনভেনশন, মিটিং, মিছিলের কর্মসূচী দিয়ে এই আক্রমণ রোখা যাবে না। আজকের দিনে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মর্মবস্তুকে হাতিয়ার করে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক মানুষের ঐক্যের ভিত্তিতে এই আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। বিগত সময়ে শাসন ক্ষমতায় থাকা প্রত্যেক দলের সাথেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সম্পর্ক গভীর। ভোটের রাজনীতি যারাই করেন, এই কাজ তারা জেনেবুঝেই করেন। ফলে ভোটের মাধ্যমে নয়, সাম্প্রদায়িকতাকে মোকাবেলা করতে হবে এর বিরুদ্ধে আদর্শিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে তীব্র করে।

মৌলিক অধিকারের শর্তহীন সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে সংস্কার করতে হবে

গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার, যাতে ক্ষমতার কাঠামো জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক হয় এবং নাগরিক অধিকার বাস্তব অর্থে নিশ্চিত হয়। কিন্তু সামনের দিনে এই সংস্কার কতটা বাস্তবায়িত হবে – তা নিয়ে জনমনে স্পষ্ট উদ্বেগ আছে। এই আশঙ্কার বাস্তব রাজনৈতিক ভিত্তিও রয়েছে। বিশেষত যখন ৯০-এর গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে তিন জোটের রূপরেখা বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও আওয়ামী লীগ- কেউই বাস্তবায়ন করেনি। কিন্তু তারা ক্ষমতায় ছিল। এর ফলে জনগণের মনে এই আশঙ্কা থাকা স্বাভাবিক যে, তারা কাঠামোগত পরিবর্তনের পথে হাঁটবে, নাকি বিদ্যমান ক্ষমতাকেন্দ্রিক ব্যবস্থাকেই বজায় রাখবে।

শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ, নারী সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনা এবং মৌলিক অধিকারসমূহের শর্তহীন সাংবিধানিক স্বীকৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় বিএনপি কিংবা জামায়াতসহ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কেউই অবস্থান গ্রহণ করেনি। অন্যদিকে ঐকমত্য কমিশনে যেসব বিষয়ে রাজনৈতিক সমঝোতা তৈরি হয়েছে, সেগুলোর বাস্তবায়ন রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলগুলোর নৈতিক দায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যদি কোনো রাজনৈতিক শক্তি গড়িমসি করে বা পিছিয়ে যেতে চায়, তাহলে জনগণের পক্ষের শক্তিগুলোকে নীরব দর্শক হয়ে থাকা চলবে না। গণভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করে জনগণকে সঙ্গে নিয়েই সংস্কারের দাবিতে ধারাবাহিক গণচাপ ও গণআন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন, যাতে সংস্কার কেবল রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিতে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তব রাষ্ট্রীয় রূপান্তরে পরিণত হয়।

জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে

গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা, ন্যায়বিচারের দাবি এবং বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছিল – তা এখনও সমাজের ভেতরে সক্রিয় ও জীবন্ত রয়েছে। কিন্তু যেহেতু এটা বিপ্লব নয়, রাষ্ট্রক্ষমতার মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি - ফলে শাসকগোষ্ঠী মূলত সেই পুরোনো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই পরিচালিত হচ্ছে। এখানে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থই নীতিনির্ধারণের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। ফলে ক্ষমতাসীন দল ক্রমান্বয়ে এমন সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে, যা সাধারণ জনগণের জীবনসংগ্রাম, দ্রব্যমূল্যের চাপ, কর্মসংস্থানের সংকট কিংবা সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্নকে উপেক্ষা করে ধনিকগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণকেই অগ্রাধিকার দেয়। এর স্বাভাবিক ফল হিসেবে জনঅসন্তোষ ও বিক্ষোভ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে, যার প্রাথমিক লক্ষণ ইতোমধ্যেই সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে দৃশ্যমান।

এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো – গণঅভ্যুত্থানের যে অসম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা সমাজে রয়ে গেছে, তা কোন রাজনৈতিক শক্তি ধারণ করবে। ইতিহাস দেখায়, যখন গণমানুষের ন্যায্য দাবি সংগঠিত রাজনৈতিক রূপ পায় না, তখন সৃষ্টি হয়

● এরপর ৩য় পৃষ্ঠায়

সাম্যবাদ
১৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা, মার্চ-২০২৬

২য় পৃষ্ঠার পর

গণঅভ্যুত্থান থেকে নির্বাচন:

এক ধরনের রাজনৈতিক শূন্যতা। আর এই শূন্যতার সুযোগই গ্রহণ করে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তিগুলো, যারা জনগণের বাস্তব অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান না দিয়ে আবেগ, ধর্মীয় বিভাজন এবং পরিচয়ের রাজনীতিকে ব্যবহার করে সমাজকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করে। ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি দুর্বল হয় এবং রাষ্ট্র আরও প্রতিক্রিয়াশীল পথে অগ্রসর হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। এমন বাস্তবতায় দেশের জনগণের করণীয় অত্যন্ত স্পষ্ট।

প্রথমত, শুধুমাত্র ক্ষমতার পালাবদলের প্রত্যাশায় সীমাবদ্ধ না থেকে রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্র সম্পর্কে সচেতন রাজনৈতিক অবস্থান গড়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয়ত, শ্রমজীবী মানুষ, শিক্ষার্থী, কৃষক, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর বাস্তব দাবির ভিত্তিতে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করার সামাজিক উদ্যোগ নিতে হবে।

তৃতীয়ত, আমেরিকা, ভারতসহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর আগ্রাসন ও

সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, গণতান্ত্রিক, যুক্তিবাদী, অসাম্প্রদায়িক জনগণের ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি গড়ে তুলতে হবে।

গণতন্ত্র কেবল নির্বাচননির্ভর কোনো প্রক্রিয়া নয়; এটি জনগণের অর্থনৈতিক অধিকার, সামাজিক মর্যাদা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ধারাবাহিক সংগ্রামের ফল। ফলে গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্খা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সচেতন নাগরিক অংশগ্রহণ, গণআন্দোলনের ধারাবাহিকতা এবং জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক শক্তিকে শক্তিশালী করা।

১ম পৃষ্ঠার পর

ব্যবস্থা বদলের বার্তা নিয়ে

এসেছে। বৈষম্যহীন সমাজের দাবি উঠেছে, রাষ্ট্র সংস্কারের আকাঙ্খা তৈরি হয়েছে। কিন্তু গত দেড় বছরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এসকল আকাঙ্খা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বিশেষ এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সঠিক বিপ্লবী রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে যেতে বাসদ (মার্কসবাদী) দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। গতবছর নভেম্বর মাসে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধিত হয়ে অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আমাদের দল। 'শুধু ক্ষমতার পালাবদল নয়, ফ্যাসিবাদের বিলোপ ও বৈষম্যহীন সমাজের জন্য চাই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন' এই বক্তব্যকে সামনে রেখে সারাদেশে ৩৪ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে দলের মনোনীত প্রার্থীরা। নির্বাচনী প্রচারণাকালে দলের রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত ৭ লক্ষ লিফলেট বিলি করা হয়। দেশের সঠিক রাজনৈতিক ইতিহাস, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা, শুধু ভোট নয় গণআন্দোলনই অধিকার আদায়ের গ্যারান্টি, গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রয়োজন কিন্তু তা স্বৈরাচারী প্রক্রিয়ায় হয় না ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যখ্যাসহ এই লিফলেটটি প্রকাশিত হয়। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দলের এই বক্তব্য মানুষ গ্রহণ করেছে। লিফলেট পড়ে অনেকেই দলের বিষয়ে আগ্রহী হয়েছেন, যোগাযোগ করেছেন।

বুর্জোয়া ব্যবস্থায় নির্বাচন মানেই টাকার খেলা। বুর্জোয়া দলের কোটিপতি প্রার্থীরা টাকা ছড়িয়ে, মিডিয়া ও পেশিশক্তি দিয়ে নির্বাচনকে প্রভাবিত করে। বাসদ (মার্কসবাদী) দল এর সম্পূর্ণ বিপরীতে জনগণের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে নির্বাচনে লড়েছে। গণ অর্থ সংগ্রহ, সমর্থক শুভানুধ্যায়ী ও কর্মীদের দেয়া অর্থে নির্বাচনী তহবিল গড়ে তুলেছে। চট্টগ্রামের গৃহশ্রমিক, সিলেটের চা শ্রমিক, গাইবান্ধার কৃষক কর্মী, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কর্মী প্রত্যেকেই সাধ্যমত এই তহবিলে অর্থ দিয়েছে। কোটিপতিদের টাকা দিয়ে ভোট কেনার সংস্কৃতির বিপরীতে এভাবে তহবিল সংগ্রহ জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি নির্মাণের ঈঙ্গিত বহন করে। এই প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য অর্থ ও প্রচারসামগ্রী আর নেতাকর্মীদের দলের প্রতি নিষ্ঠা-ভালবাসার শক্তিতে হয়েছে নির্বাচনী প্রচার। পায়ে হেঁটে, দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রমে দলের বক্তব্য প্রচার করেছে। অনেকক্ষেত্রে প্রার্থী একা প্রচার করেছেন। প্রায় প্রত্যেকটি আসনে সাধারণ মানুষ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সাধ্যমত সহযোগিতা করেছেন। দলের বক্তব্য ও সংস্কৃতিতে আকর্ষিত হয়ে স্বউদ্যোগে অনেকে প্রচারণায় যুক্ত হয়েছেন। মৌলভীবাজার -২ (কুলাউড়া) আসনে প্রখ্যাত জিনবিজ্ঞানী আবেদ চৌধুরী বাসদ (মার্কসবাদী) প্রার্থী সাদিয়া নোশিন তাসনীম চৌধুরীকে সমর্থন করেন, সরাসরি প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন। একইভাবে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন আসনে বিশিষ্ট নাগরিকরা আমাদের প্রার্থীদের সমর্থন ও সহযোগিতা করেন। দলের প্রার্থী ও নেতাকর্মীরা যেখানেই দলের বক্তব্য রেখেছেন মানুষ সমর্থন করেছে। নিজেদের নানা সংকটের কথা বলেছে, আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রত্যয় জানিয়েছে। ভোটের মাধ্যমে নয় গণআন্দোলনই যে অধিকার আদায়ের পথ দলের এই বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেছে। তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে গত ৫৪ বছর ধরে ভোট দিয়ে বিভিন্ন দলকে ক্ষমতায় বসিয়ে কোন সংকটের সমাধান হয়নি। বরং নতুন নতুন সংকট তৈরি হয়েছে। ধনী গরীবের বৈষম্য বেড়েছে কয়েকগুণ। অথচ খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, কাজের মত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত কোটি কোটি মানুষ। তাই অধিকার বঞ্চিত সাধারণ মানুষের মুক্তির পথ নিজস্ব সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান সাড়া জাগিয়েছে।

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তীতে সংস্কার কমিশনের আলোচনায় অন্যতম বিষয় ছিল রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো। দলীয় মনোনয়নে ৩০ শতাংশ নারী প্রার্থী ও সংরক্ষিত নারী আসন ১০০ টিতে উন্নীত করে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবি উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত কয়েকটি দলের বিরোধিতায় তা বাস্তবায়িত হয়নি। যদিও এবারের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কোন দল সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। সেখানে বাসদ (মার্কসবাদী) দল ৩৪ আসনের মধ্যে সর্বোচ্চ ১০ আসনে নারী প্রার্থী দিয়েছে। নারীর মর্যাদা ও সমানাধিকার বাস্তবায়নে বাসদ (মার্কসবাদী) এর এই সিদ্ধান্ত প্রশংসিত হয়েছে। শুধু সর্বোচ্চ সংখ্যায় নারী প্রার্থী দেয়া নয়, দলের নারী প্রার্থী ও নারী কর্মীদের নির্বাচনী মাঠে সাবলীল উপস্থিতিও সামন্তীয় সংস্কৃতির বিপরীতে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে।

নির্বাচন পরবর্তী মূল্যায়ন সভায় বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা বলেন- 'গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী এই নির্বাচনে আমাদের সীমিত সামর্থ দিয়ে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে দলের বক্তব্য নিয়ে যাওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। শুধু ক্ষমতার পালাবদল নয় ব্যবস্থা বদলের জন্য গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জনগণের মাঝে সাড়া জাগিয়েছে। কিন্তু পুঁজিপতি শ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলোর টাকা, প্রচার মাধ্যম, ধর্ম আর পেশিশক্তির প্রভাবে জনগণকে নির্বাচনী ঘূর্ণিপাকে নিমজ্জিত করেছে। আমাদের দলের বক্তব্য ও সংস্কৃতি মানুষ যেভাবে গ্রহণ করেছে তাতে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়। আগামী দিনে আমরা জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন ও গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সর্বোচ্চ মনযোগী হব। এই পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যারা বিভিন্নভাবে আমাদের দলকে সহযোগিতা করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানাই।'

শেষ পৃষ্ঠার পর

দেশবিরোধী চুক্তি বাতিল কর

দেখলে যেকোন বিবেকবান মানুষ বুঝবেন কীভাবে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে। আমেরিকা ইরান, ভেনেজুয়েলা, ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সামরিক হামলা করছে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করছে। বিভিন্ন দেশের ওপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা দিয়ে কোটি কোটি মানুষকে মানবেতর জীবনে ঠেলে দিচ্ছে। চীন, রাশিয়া, ইউরোপের দেশগুলোর সাথে আমেরিকার দ্বন্দ্ব ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে আমেরিকার সাথে এমন নতজানু এবং তাঁবেদারি চুক্তি বাংলাদেশকে ভয়াবহ বিপদের দিকে ঠেলে দিবে। পনের বছর আমরা দেখেছি আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার দেশের স্বার্থ বিকিয়ে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশ বিশেষত ভারতের সাথে বিভিন্ন চুক্তি করেছে। আওয়ামী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম দাবি ছিল দেশবিরোধী সকল চুক্তি বাতিল করতে হবে। সকল বৈদেশিক চুক্তি সংসদে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে ও জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু হাজারো ছাত্র জনতার প্রাণের বিনিময়ে সংঘটিত অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার এই জনদাবী উপেক্ষা করে একের পর এক সিদ্ধান্ত, বিশেষত: আমেরিকার স্বার্থসংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে। তারা ক্ষমতা গ্রহণ করে চট্টগ্রাম বন্দর, লালদিয়া-পাঁনগাও টার্মিনাল ইজারা দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। মায়ানমারে মানবিক করিডোর দেয়ার নামে দেশকে যুদ্ধের দিকে নিতে চেয়েছে। জনগণ, বিশেষত বামপন্থীদের আন্দোলনের চাপে কিছু সিদ্ধান্ত তারা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। সর্বশেষ নির্বাচনের আগ মূহুর্তে তড়িঘড়ি করে এই কালো চুক্তি করেছে। বাসদ (মার্কসবাদী) দলসহ বামপন্থী দেশপ্রেমিক জনগণ এই চুক্তি বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করছে। নির্বাচনে বিজয়ী বিএনপি সরকার এই চুক্তি বাতিলের কোন পদক্ষেপ এখনও গ্রহণ করে নাই। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে নবনির্বাচিত সরকার দেশের স্বার্থ দেখবে নাকি ইউনুস সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার পদলেহন করবে- তা তাদেরকেই নির্ধারণ করতে হবে। তা না হলে দেশপ্রেমিক জনগণ আন্দোলনের মাধ্যমে সকল কালো চুক্তি বাতিলে সরকারকে বাধ্য করবে।

আলুচাষীরা আর কত ঠকবে?

সারের কালোবাজারি বন্ধ কর

আলুর বাজারদর কেজিপ্রতি ৩-৪ টাকাতে নেমেছে এবং দেশজুড়ে বোরো আবাদের জন্য প্রয়োজনীয় সারের সংকট ও দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। আলু আমাদের প্রধান সবজি এবং অর্থকরী ফসল। বিশ্বব্যাপী আলুর চাহিদা ব্যাপক। উত্তরবঙ্গের জমি এবং আবহাওয়া আলু চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। ফলে এই অঞ্চলের কৃষকরা প্রচুর আলু উৎপাদন করে। কিন্তু আলুর বাম্পার ফলন হলেও কৃষক লাভের মুখ দেখতে পারে না। আলু যেহেতু পঁচনশীল সবজি, তাই কৃষক বেশিদিন আলু ঘরে রাখতে পারে না। দ্রুত তাকে আলু বিক্রি করতে হয়। এই সময়ে ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে দাম কমিয়ে দেয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কৃষক কোল্ডষ্টোরে আলু রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু আলুর সিন্ডিকেট ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন কোম্পানি ষ্টোর মালিকদের সাথে যোগসাজশ করে ষ্টোরের বেশিরভাগ জায়গা আগেই বুকিং করে রাখে। ফলে কৃষকরা কোল্ডষ্টোরেও জায়গা পায়না। এভাবে ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের সাথে কোল্ডষ্টোর মালিকদের সিন্ডিকেট যুক্ত হয়ে কৃষককে পানির দরে আলু বিক্রি করতে বাধ্য করে। এবছর আলুর দামে আবার ধস নেমেছে। এক কেজি আলুর দাম এক কাপ চায়ের দামের চেয়ে কম। অথচ সার, বীজ, সেচ ও শ্রমিকের মজুরি মিলিয়ে প্রতি কেজি আলু উৎপাদনে চাষীর খরচ হয়েছে ১৭ থেকে ১৮ টাকা। গত কয়েকবছর ধরে এভাবে লোকসান করতে করতে আলুচাষীরা আলুচাষের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন এলাকায় আলুর পরিবর্তে কৃষকগণ তামাক চাষ শুরু করেছে। যা আমাদের কৃষির জন্য অশনিসংকেত। এই আলু বিদেশ থেকে আমদানি করলে কয়েকগুন বেশি দামে জনগণকে তা কিনে খেতে হবে। প্রশাসনের তদারকির অভাবে গতবছর কোল্ডষ্টোর মালিকরা রাতারাতি আলুর ভাড়া দ্বিগুন করে দিয়েছে। এক বস্তা আলুর ষ্টোর ভাড়া ছিলো ২৮০ টাকা, গতবছর তা বাড়িয়ে একই পরিমাণ আলু রাখার জন্য স্টোরভাড়া ৫৬০ টাকা করা হয়েছে। এভাবে খরচ বৃদ্ধি এবং দাম কমে যাওয়ায় আলুচাষীরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

অপরদিকে চলমান বোরো মৌসুমে দেশজুড়ে সারের সংকট ও দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক জায়গায় কেজিপ্রতি ৮-১০ টাকা বেশি নিচ্ছে। প্রতিটা ফসলের মৌসুমে সারের ডিলার এবং ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে সারের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দ্বিগুন, তিনগুন দামে কৃষককে সার কিনতে বাধ্য করে। প্রশাসন বিভিন্ন স্থানে নামমাত্র অভিযান পরিচালনা করলেও তা কাজে আসছে না। কালোবাজারি ও সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে কৃষক আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তীতে সারের কালোবাজারি বন্ধ বা আলুর দাম বৃদ্ধিতে কার্যকর কোন পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয় নাই।

বাসদ (মার্কসবাদী)-র নির্বাচনী মূল্যায়ন সভা

২৬-২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ দুইদিন ব্যাপী বাসদ (মার্কসবাদী) দলের উদ্যোগে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা। সভায় দলের সংসদ সদস্য প্রার্থী এবং নেতাকর্মীরা তাদের নির্বাচনী অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়ন তুলে ধরেন।

১৪ ফেব্রুয়ারী স্বৈরাচার বিরোধী ছাত্র প্রতিরোধ দিবসে শিক্ষা অধিকার চত্বরে শহীদদের প্রতি সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট-এর শ্রদ্ধা নিবেদন।

শ্রীলংকায় দক্ষিণ এশিয়ার বামপন্থী ছাত্র সংগঠনসমূহের বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ২৮-৩০ জানুয়ারি ২০২৬ তিন দিনব্যাপী দক্ষিণ এশিয়ার বামপন্থী ছাত্র সংগঠনসমূহের বৈঠক শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেপাল, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার ৮ টি সংগঠন অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ থেকে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট-এর পক্ষে অংশগ্রহণ করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সালমান সিদ্দিকী। অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহ হলো SSSU (নেপাল), ANSU (নেপাল), ANNISU (নেপাল), SSF (বাংলাদেশ), AISF (ভারত), NSF (পাকিস্থান), AIDSO (ভারত), RSU (শ্রিলঙ্কা)
বৈঠকে শিক্ষার ওপর পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিভিন্ন দিক ও বাংলাদেশে সংঘটিত ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান নিয়ে আলোচনা হয়। নেতৃবৃন্দ 'কলম্বো ঘোষণা'য় (COLOMBO DECLARATION) স্বাক্ষর করেন এবং সামনের দিনে শিক্ষার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় দক্ষিণ এশিয়ায় শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ইরানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ সামরিক আক্রমণের প্রতিবাদে নোয়াখালীতে বাসদ (মার্কসবাদী) দলের প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ও বক্তব্য রাখেন পার্টি জেলা সমন্বয়ক কমরেড বিটুল তালুকদার এবং সদস্য আনোয়ারুল হক পলাশ।

মহান ভাষা শহীদ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

২১ ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাসদ (মার্কসবাদী), সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, বাংলাদেশ যুব ফ্রন্ট এর ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। সারাদেশে বিভিন্ন জেলা উপজেলায় দল ও গণসংগঠনের উদ্যোগে

ইরানে হামলার প্রতিবাদে 'গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট' এর বিক্ষোভ

ইরানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের সামরিক হামলার প্রতিবাদে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের অন্যায্য বাণিজ্যচুক্তি বাতিলের দাবিতে ৪ মার্চ ২০২৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে 'গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট'-এর বিক্ষোভ সমাবেশ!

২১ শে ফেব্রুয়ারিতে 'বাংলাদেশ যুব ফ্রন্ট' এর পুষ্পমাল্য অর্পণ

মহান ভাষা শহীদদের স্মরণে বাংলাদেশ যুব ফ্রন্ট শেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। জেলা শাখার আহ্বায়ক মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন জেলার সংগঠকবৃন্দ।

বাংলাদেশ যুব ফ্রন্ট ময়মনসিংহ জেলা শাখার উদ্যোগে শম্ভুগঞ্জ ব্রীজ মোড়ে অবস্থিত শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা সংগঠক অসীম তুহিন, জুয়েল আহমেদ সহ অন্যান্যরা।

সাম্যবাদ
১৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা, মার্চ-২০২৬

১ম পৃষ্ঠার পর

শুধু ক্ষমতার পালাবদল নয়-

সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। মাজার-খানকাহ্-মন্দিরসহ ভিন্ন মত ও পথের মানুষের ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর আক্রমণ এবং বীভৎস হত্যাকাণ্ড, নারীদের উপর শারীরিক আক্রমণ ও অনলাইন ব্যাশিং হাতেনাতে প্রমাণ করছে যে- ফ্যাসিবাদ যায়নি, গিয়েছে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্বকারী একটি দল। ব্যবস্থাটি বেশ ভালমতোই টিকে আছে, এর প্রতিনিধিত্বকারী পাল্টেছে মাত্র।

শুধু সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংকটই নয়, গণঅভ্যুত্থানের পরে মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাও নিশ্চিত করতে পারেনি রাষ্ট্র। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দুর্নীতি বন্ধ হয়নি। গরীব-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষ তাদের অসহ্য জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়নি। এর কোন চেষ্টাও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার করেনি। দেশের মোট সম্পদের ৫৮ শতাংশের মালিকানা সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ মানুষের হাতে। এর মধ্যে শীর্ষ ১ শতাংশ ধনীর কাছেই রয়েছে মোট সম্পদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। দেশের অর্ধেক অর্থাৎ ৫০ শতাংশ মানুষ মাত্র ৪.৭ শতাংশ সম্পদের মালিক। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে প্রায় ৯ থেকে ১১ হাজার কোটি টাকার নতুন ব্যাংক হিসাব যুক্ত হয়েছে, যার সংখ্যা বর্তমানে মোট ১ লাখ ২৮ হাজার ছাড়িয়েছে। একইসাথে দরিদ্র ও কোটিপতির সংখ্যা বৃদ্ধি বৈষম্যবৃদ্ধির এক চূড়ান্ত নিদর্শন, যা স্বাধীনতার পর থেকেই চলমান এবং গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়েও এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি। ফলে বোঝাই যায়, আওয়ামী লীগ সরে গিয়ে যারাই আসুক, রাষ্ট্র পরিচালনা করে সেই ১০ শতাংশ ধনী, আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে সেই দশের মধ্যে ১ শতাংশ। অথচ গণঅভ্যুত্থানে বৈষম্যহীনতা, সমতা, সাম্য- এই স্লোগানগুলো উঠেছিল। গণতন্ত্রের পক্ষে, দুর্নীতি-লুটপাটের বিরুদ্ধে মানুষ আওয়াজ তুলেছিল। কিন্তু পরিবর্তন ঘটেনি। মানুষ আজও মুক্তির রাস্তা খুঁজছে।

বাসদ (মার্কসবাদী) কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়

যে কোনভাবেই নির্বাচনে অংশ নিতে হবে, যে কোন পন্থায় ভোট জোগাড় করতে হবে, সিট বাড়াতে হবে, যার সাথে ঐক্যে গেলে সিট বাড়ানো যায় তার সাথে ঐক্যে যেতে হবে- এই ধরনের নীতিহীন সুবিধাবাদী রাজনীতির চর্চা একটা যথার্থ মার্কসবাদী দল হিসেবে আমরা কখনও করিনি। আমরা শতকরা ১০ শতাংশ ধনীদের স্বার্থরক্ষার রাষ্ট্রের পরিবর্তে শতকরা ৯০ শতাংশ সাধারণ মানুষের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমরা মনে করি, সমাজবিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই একমাত্র এই বৈষম্য দূর করা সম্ভব। সেই লক্ষ্যে আমরা জনগণের জ্বলন্ত সমস্যাগুলোকে নিয়ে আন্দোলন করি। যারা আমাদের চেনেন, তারা এটা জানেন। আমরা মনে করি, বর্তমান সমাজব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক, জনগণের মৌলিক সমস্যার কোন সমাধান হবে না। এটা আগেও হয়নি, এখনও সম্ভব নয়। এটা একমাত্র সম্ভব হতে পারে বর্তমান সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে। তা সত্ত্বেও একটা বিপ্লবী দল হিসেবে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত শোষিত জনগণকে বিপ্লবের জন্য আদর্শগতভাবে, রাজনৈতিকভাবে, সাংগঠনিকভাবে ও নৈতিকভাবে প্রস্তুত করতে না পারছি- ততক্ষণ এই ব্যবস্থায় বারবার নির্বাচন আসবে, জনগণ ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক নির্বাচনকেই তার অবস্থা পরিবর্তনের হাতিয়ার মনে করবে, এর জালে জড়িয়ে পড়বে। এই জনগণকে নির্বাচন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ধরানোর জন্য, নির্বাচনের মোহ কাটানোর জন্য এবং সংসদের অভ্যন্তরে শোষিত জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে দাবি উত্থাপন ও প্রতিবাদ ধ্বনিত করার জন্য আমরা নির্বাচনে লড়ি। একইসাথে সংসদের বাইরে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের সংগ্রাম ও গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা নির্বাচনে লড়ি। এটাই বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান পথপ্রদর্শক কমরেড লেনিনের শিক্ষা।

একটা যথার্থ মার্কসবাদী দল হিসেবে ভোটের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় গেলে কী করবে সে সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন মহান লেনিনের সুযোগ্য ছাত্র, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি বলেছেন, একটি যথার্থ বামপন্থী সরকার-

১) শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যবিত্ত জনগণের ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনকে উৎসাহিত করবে। 'ল অ্যান্ড অর্ডার" রক্ষার নামে অন্য বুর্জোয়া সরকারগুলোর মতো পুলিশ দিয়ে সেগুলোকে দমন করবে না।

২) আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা খর্ব করে সংগঠিত সচেতন জনগণের উপর নির্ভর করে সরকার চালাবে।

৩) দুর্নীতিমুক্ত নিরপেক্ষ প্রশাসন চালাবে এবং সরকারি অর্থ জনকল্যাণমূলক খাতে এবং সবচেয়ে দরিদ্র মানুষের স্বার্থে কাজে লাগাবে। এবারের নির্বাচনে আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই অংশগ্রহণ করব।

বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাস নিয়ে আমাদের বক্তব্য

আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত কৃতিত্ব তাদের দল ও শেখ মুজিবের বলে প্রচার করেছে। অথচ পাকিস্তান পর্বে গোটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আপোষহীন নেতা ছিলেন মওলানা ভাসানী। ভাসানীই প্রথম প্রকাশ্য জনসভায় স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, বামপন্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বামপন্থীদের বন্ধু। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংবিধান রচনার সমালোচনা তিনি যেমন করেছেন, তেমনি গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে সংবিধানে যুক্ত করার ব্যাপারে জোর দাবি জানিয়েছেন। সারাটা জীবন ধরে ভাসানী লড়েছেন। প্রথমে লড়েছেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, এরপর পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে, লড়েছে সমস্তরকম রাজনৈতিক সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে। সর্বোপরি তিনি লড়েছেন মজলুমের পক্ষে জালেমের বিরুদ্ধে। একারণে দেশের উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণি ভাসানীকে নেতা হিসেবে সামনে রাখতে চায়নি। দেশের উঠতি বুর্জোয়াশ্রেণির দল আওয়ামী লীগের হাতে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব থাকার কারণে তারা ও ভারত মিলে ভাসানীকে গোটা মুক্তিযুদ্ধ থেকেই বিচ্ছিন্ন করে রাখে। কারণ এই উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণি ও ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ- উভয়েই জানতো ভাসানী তাদের জন্য কতবড় হুমকি।

ভাসানীকে ধর্মীয় দলগুলোও পছন্দ করতো না সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর বিশ্বাসের কারণে ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়ে তাঁর অবস্থানের জন্য। ফলে আওয়ামী লীগ, বিএনপি কিংবা ধর্মীয় দলগুলোর কেউ-ই তাকে সামনে আনেনি। প্রত্যেকে তাদের মতো করে বাংলাদেশ গঠনের ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেছে।

বাংলাদেশ গঠনের প্রকৃত ইতিহাস অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় উপনিবেশিক শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের উপর নিপীড়ন, পাকিস্তানভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিপরীতে ভাষাভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি, গোটা পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনপর্বে ভাসানীর ভূমিকা- এই বিষয়গুলো ইতিহাসের ব্যাখ্যায় আমাদের দল ইতোপূর্বে বারবার তুলে ধরেছে। একইসাথে বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয়দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচন- আর এই সমগ্র আন্দোলনের ধরাবাহিকতায় যে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, এই ধারাবাহিক ইতিহাস আমাদের দল জনগণের সামনে তুলে ধরেছে।

মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানের উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণির দল আওয়ামী লীগের হাতে থাকায় স্বাধীনতার পর দেশটি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক পথে চলা শুরু করে। আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল শক্তিকে নিয়ে লড়াইয়ের যুক্তফ্রন্ট গঠন করলো না, স্বাধীনতার লাভের পর এই সকল শক্তিকে যুক্ত করে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করলো না, গণপরিষদ নির্বাচন না করেই সংবিধান প্রণয়ন করলো এবং সর্বোপরি স্বাধীনতার পর প্রথম নির্বাচনে (১৯৭৩ সালের নির্বাচন) রিগিং করলো- যে নির্বাচনে বিজয় তার নিশ্চিত ছিল। এতেই সে থামেনি। এরপর নিজেদের প্রণয়ন করা সংবিধান নিজেরাই সংশোধন করে এর মধ্যে গণতন্ত্রের যতটুকু চিহ্ন ছিল- সেটাও মুছে দিতে তৎপর হলো। সর্বশেষ চতুর্থ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে সকল দলকে বিলুপ্ত করে দিয়ে একদলীয় শাসনব্যবস্থা বাকশাল কায়েম করলো। এটা খুবই দুঃখজনক যে, এসময় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এই স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যেত, একটি প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টির অনুপস্থিতির কারণে তা করা যায়নি। এরপর থেকে যারাই ক্ষমতায় এসেছে, তারাই এই ব্যবস্থাই বহাল রেখেছে। এই পটভূমিতেই আওয়ামী লীগের চরম ফ্যাসিবাদী শাসনের আবির্ভাব- যার বিরুদ্ধে সংঘটিত হলো ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান।

জুলাই অভ্যুত্থানের তাৎপর্য ও ফ্যাসিবাদ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য

ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে রাষ্ট্রের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান অকার্যকর ও পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রীর হাতেই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী কোন সরকারই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পক্ষে ছিল না, কিন্তু আওয়ামী লীগের বিগত ১৫ বছরের শাসনামলের মতো রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানকে এতখানি কুক্ষিগত কেউ করতে পারেনি। নির্বাচন কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশনসহ সকল সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি দলীয় আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কার্যতঃ অনির্বাচিত সংসদ, দলীয় প্রশাসন ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে সমস্ত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়।

জনগণ ছিল অতীষ্ঠ। প্রতিবাদ করলেই তা দমন করা হত। ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের শাসনামলে দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন ২ হাজার ৬৯৯ জন, গুম হন ৬৭৭ জন, কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন ১ হাজার ৪৮ জন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহতদের তালিকাসহ ২০২৪ সালের ঘটনা যুক্ত করলে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় তিন হাজার। (মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার'-এর তথ্য অনুযায়ী)

বোঝাই যায় কী ধরনের পরিস্থিতি দেশে সৃষ্টি হয়েছিল! অর্থনীতি বিষয়ক শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির দেয়া তথ্য অনুসারে ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বিদেশে পাচার করা হয়েছে প্রায় ২৮ লক্ষ কোটি টাকা, শেয়ার বাজার থেকে আত্মসাৎ করা হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা, বিভিন্ন প্রকল্প থেকে লুটপাট করা হয়েছে প্রায় পৌনে ৩ লক্ষ কোটি টাকা। ধনী-গরীবের বৈষম্য উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, বেড়েছে মুদ্রাস্ফীতি। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে সাধারণ মানুষ নিঃশ্বাস নিতে পারছিলেন না। শ্রমিকদের সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদের প্রতিবাদ সমাবেশে গুলি চালানো, কৃষকদের ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া- এ ছিল স্বাভাবিক চিত্র। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও দফতরগুলোতে ঘুষ-দুর্নীতি-লুটপাটের কারণে সাধারণ মানুষ ন্যূনতম পরিসেবা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছিলেন। শ্বেতপত্রে প্রকাশ- ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ নেতারা ১ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছেন, আমলারা নিয়েছেন ৯৮ হাজার কোটি টাকা।

এর বিরুদ্ধে মানুষের মনে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল তার ফলাফল এই গণঅভ্যুত্থান। আওয়ামী লীগের গত ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব জাগরণ এই গণঅভ্যুত্থান। প্রায় দেড় হাজারেরও অধিক প্রাণ দিয়েছেন এই আন্দোলনে। আহত হয়েছেন ২৫ হাজারেরও অধিক। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে পরিচালিত এই গণঅভ্যুত্থানে বামপন্থীরা লড়েছে, রক্ত ঝরিয়েছে। এদেশে কোন গণঅভ্যুত্থানকেই এত রক্তের স্রোত পাড়ি দিতে হয়নি। এত মানুষকে চোখের দৃষ্টি হারাতে হয়নি, পঙ্গু হতে হয়নি। এই বিরাট আত্মত্যাগ এই সময়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের দল জুলাই হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে লড়বে।

এই গণঅভ্যুত্থান থেকে ফ্যাসিবাদ ধ্বংসের স্লোগান উঠেছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের পতন মানেই ফ্যাসিবাদের পতন নয়। ফ্যাসিবাদ কোন দল আনে না, ফ্যাসিবাদ আনে একটি ব্যবস্থা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে উন্নত কিংবা অনুন্নত সকল দেশেই ফ্যাসিবাদী প্রবণতা দেখা যায়। ফ্যাসিবাদ কায়েম একদলীয় শাসনের মাধ্যমে হতে পারে, দ্বি-দলীয় শাসনের মাধ্যমে হতে পারে, সামরিক শাসনের মাধ্যমে হতে পারে। দুনিয়ার দেশে দেশে ফ্যাসিবাদ গণতন্ত্রের মুখোশ পড়েই এসেছে। আজকের যুগে কোন পুঁজিবাদী দেশই জনজীবনের কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না। ফলে সে জনগণের বিক্ষোভ দমনে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে। এই ফ্যাসিবাদী প্রবণতা এ যুগে প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী দেশে বিদ্যমান। অর্থাৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র মাত্রেই সে আজ কমবেশি ফ্যাসিবাদী।

● এরপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

৫ম পৃষ্ঠার পর

শুধু ক্ষমতার পালাবদল নয়-

এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদের বিলোপ ঘটেনি, ফ্যাসিবাদ পিছু হটেছে মাত্র। রাষ্ট্রের নানা গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি এই অভ্যুত্থান পরবর্তীতে উঠেছে। কারণ আওয়ামী লীগের ১৬ বছরের শাসনে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এই গণতান্ত্রিক সংস্কার অপরিহার্য, তাতে দেশের গণতান্ত্রিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠান কিছুটা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তাতে ফ্যাসিবাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সম্ভব নয়। এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ না ঘটিয়ে ফ্যাসিবাদের উচ্ছেদ সম্ভব নয়। তা না হলে অনেক আত্মত্যাগের মাধ্যমে বারবার ভোটের অধিকার, মতপ্রকাশের অধিকার অর্জিত হবে- আর গণআন্দোলনের শক্তি দুর্বল হলে, আন্দোলনের নেতৃত্ব পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের দলগুলোর হাতে থাকলে, বারবারই তা হাতছাড়া হবে। আবারও নেমে আসবে নির্মম গণতন্ত্রহীন পরিবেশ। তাই কোন পথে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন প্রকৃত অর্থেই সফল হতে পারে- সেটা নির্ধারণ করা ও সে পথে সংগ্রাম পরিচালনা করা গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, এরপর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পেরিয়ে আবার ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থান এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থান- এই শিক্ষাই আমাদের সামনে তুলে ধরছে।

মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য

গণঅভ্যুত্থানের পর উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির তৎপরতা বেড়েছে। মাজার, মন্দির, খানকায়ে হামলা ও আক্রমণ হয়েছে। নারীদের উপর রাস্তাঘাটে আক্রমণ হয়েছে, নিপীড়ন হয়েছে। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর উপর আক্রমণ হয়েছে। প্রতিদিনই তাদের আস্ফালন গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িকতার উত্থান গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ঘটেনি। আওয়ামী লীগ সরকারের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়েই এই সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটেছে। তারা সাম্প্রদায়িক শক্তিকে নিজেদের রাজনৈতিক কূটকৌশল বাস্তবায়নে ব্যবহার করেছেন। স্বাধীনতার পর থেকে যে সরকারই ক্ষমতায় গেছে- তারাই উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রসদ জুগিয়েছে, জনগণকে বিভক্ত করার জন্য ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঘায়েল করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করেছে। আজ আমরা তার ফলাফল দেখতে পাচ্ছি।

এ ঘটনা ঘটতে পারলো কেন? একটা যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারতো না। ইতিহাসের শিক্ষা প্রমাণ করে যে, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী লড়াই মানেই কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা কথার যথার্থ অর্থ হচ্ছে রাজনীতি, রাষ্ট্র, শিক্ষা, আইন,কানুন ইত্যাদির সাথে ধর্মের সম্পর্ক থাকবে না। ধর্ম পালনের অধিকার মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। ধর্মবিশ্বাসী এবং কোনো ধর্মে বিশ্বাস করেন না- এই দুই ধরনের নাগরিককে রাষ্ট্র সমদৃষ্টিতে দেখবে। এই চিন্তা এসেছিল ইউরোপের নবজাগরণ থেকে যা আমাদের দেশ এবং উপমহাদেশে চর্চা করা হয়নি। এর ফলেই ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, জাত-পাত এই বিষয়গুলো ধুরন্ধর রাজনৈতিক শক্তির ক্ষমতালাভের হাতিয়ার হয়ে জনসাধারণের ঐক্যকে টুকরো টুকরো করে দিতে পারছে। একে আটকাতে গেলে জোরদার আদর্শগত লড়াই চালাতে হবে। গরীব-মেহনতি মানুষের উপর যে একের পর এক অর্থনৈতিক আক্রমণ আসছে এর বিরুদ্ধে লড়াইকে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আদর্শিক লড়াইয়ের সাথে যুক্ত করতে হবে। জনগণকে সংগঠিত করে ক্রমাগত এই অর্থনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শুধু কনভেনশন, মিটিং, মিছিল এই ধরনের কর্মসূচী দিয়ে এই আক্রমণ রোখা যাবে না। বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক মানুষের ঐক্যের ভিত্তিতে এই আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে।

একটা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে দেশ যখন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হয়, তখন বুর্জোয়া শ্রেণি একটা অখণ্ড জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে যদি সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঝাণ্ডাকে তুলে না ধরে, অর্থাৎ ওই ভৌগলিক ভূ-খণ্ডে নানান জাতিসত্ত্বা-ধর্ম-বর্ণ এসবের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, এগুলোকে যদি সমাধান না করে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার বদলে ক্রমাগত বিভেদের চক্রান্ত করতে থাকে, তবে স্বাভাবিক নিয়মেই জাতিবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা এসব কুৎসিত বিষয় জন্ম নেয় এবং যথার্থ অখণ্ড জাতি গড়ে উঠে না। আজকের দিনে এটা একমাত্র সম্ভব রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মর্মবস্তুকে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে।

বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি কিংবা অধুনা উদার সাজা জামায়াতে ইসলামী প্রত্যেকের সাথেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সম্পর্ক গভীর। ভোটের রাজনীতি যারাই করেন, এই কাজ তারা জেনেবুঝেই করেন। ফলে ভোটের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতাকে নির্মূল করা যাবে না। সাম্প্রদায়িকতাকে মোকাবেলা করতে হবে আদর্শিক ও রাজনৈতিকভাবে। এই বিভাজন ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত করছেন না- নিজের ধর্মকেও খাট করছেন, ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করছেন। আমাদের দল এই সত্যটি জনগণের সামনে তুলে ধরবে ও এই দলগুলোর প্রকৃত চেহারা উন্মোচন করবে।

সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য

বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই দুনিয়ার বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, যেমন- ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলো এবং পরবর্তীকালে চীন, রাশিয়া, জাপান ইত্যাদি দেশগুলো তাদের বাজার সম্প্রসারনের লক্ষে এদেশের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের উপর বারংবার হস্তক্ষেপ করেছে। বর্তমান সময়ে এই হস্তক্ষেপ অনেকগুণ বেড়েছে। সম্প্রতি চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন টার্মিনাল দরপত্র ছাড়াই, গোপন চুক্তির মাধ্যমে যেভাবে ইজারা দেয়া হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে সরকার যে ধরনের বেপরোয়া ভাব দেখাচ্ছেন- তাতে আমরা শঙ্কিত। বিগত সময়ে ভারতসহ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কাছে আওয়ামী লীগের নতজানু পররাষ্ট্রনীতি আমরা দেখেছি। গণঅভ্যুত্থানের পর আমরা এমন একটি সরকার প্রত্যাশা করেছি- যে সরকার সকল ধরনের বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বকে অগ্রাধিকার দেবে। আমাদের দল মনে করে, সবরকম সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত। দেশকে কোনভাবেই জিম্মি রাখা যাবে না। দেশের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখা সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

জুলাই সনদ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য

রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে দীর্ঘ প্রায় ৮ মাস আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক শেষে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন যে জুলাই সনদ প্রণয়ন করে, সেটি এই দীর্ঘ আলোচনার মর্মবস্তুকে ধারণ করতে পারেনি। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা উদ্বোধনী সভায় বলেছিলেন যে, সবাই যে সকল বিষয়ে একমত হতে পারবে, সেগুলোই গ্রহণ করা হবে। ফলে আলোচনার সময়ে বিভিন্ন প্রস্তাবে বিভিন্ন দল 'নোট অব ডিসেন্ট' দেয়ার পর সেই 'নোট অব ডিসেন্ট'-গুলোকে যুক্ত করেই সনদ রচনা করা হলো। এই কারণগুলোসহ নিম্নলিখিত কারণে আমরা জুলাই সনদের আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেও তাতে স্বাক্ষর করতে পারিনি-

১. আমরা জুলাই সনদ নিয়ে আলোচনাকালেই বারবার বলেছি, যেসব বিষয়ে সবার ঐকমত্য রয়েছে কেবলমাত্র সেসব বিষয়েই সবার স্বাক্ষর নেয়া যেতে পারে। ভিন্নমতগুলো অতিরিক্ত (এনেক্স) প্রতিবেদন হিসেবে সনদে সংযুক্ত থাকতে পারে।

২. সনদের প্রথম অংশে পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়নি। আমরা বারবার সংশোধনী দিলেও সেগুলো সন্নিবেশিত করা হয়নি।

৩. শেষ অংশে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে অঙ্গীকার করতে বলা হয়েছে। সেখানে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ভিন্নমত থাকলে তা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার কিভাবে সম্ভব তা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়।

৪. অঙ্গীকারনামার ২নং-এ জুলাই সনদ সংবিধানের তফসিলে বা যথোপযুক্ত স্থানে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। আমরাও সর্বসম্মত জুলাই সনদ সংবিধানে যুক্ত করার পক্ষে। কিন্তু নোট অব ডিসেন্টসহ কীভাবে সংবিধানে যুক্ত হবে, তা আমাদের বোধগম্য নয়।

৫. অঙ্গীকারনামার ৩নং-এ উল্লেখ করা হয়েছে- "জুলাই সনদ নিয়ে কেউ আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে না"। এটি নাগরিকের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী। যে সকল বিষয়ে একটা দলের 'নোট অব ডিসেন্ট' ছিল- সেটা বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নিলে, সেই দল আদালতের শরণাপন্ন হতেই পারে। এই অধিকার কেড়ে নেয়ার কোন উপায় নেই।

আমরা বলেছিলাম যে, উপরোক্ত বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি না হওয়াতে আমাদের পক্ষে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করা সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে সংবিধানে বিদ্যমান চার মূলনীতি- গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ পরিবর্তনে সম্মতি প্রদান ও আদালতে প্রশ্ন করা যাবে না এমন বিষয়ে অঙ্গীকার করতে হয়- এমন কোনো সনদে ভিন্নমত দিয়ে আমরা স্বাক্ষর করতে পারি না। এই কথাগুলো আমরা সেসময় সংবাদ সম্মেলন করে জাতির সামনে তুলে ধরেছিলাম।

গণভোট প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য

জুলাই সনদ প্রসঙ্গে আমরা নীতিগতভাবে গণভোটকে সমর্থন করেছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন যেভাবে সাংবিধানিক সংস্কারগুলোকে চারটি প্রশ্নের একটি প্যাকেজের মধ্যে এনে পুরো প্যাকেজের উপরেই 'হ্যাঁ/না' ভোটের সিদ্ধান্ত নেয়, সেটি ছিল পুরোপুরি অগণতান্ত্রিক। কেউ এর অনেকগুলোর সাথে একমত, অনেকগুলোর সাথে দ্বিমত থাকতে পারেন। সবগুলোর সাথে একমত হলেও, কোন একটি প্রস্তাবের সাথে দ্বিমত হলেও তার সেই মত প্রকাশের অধিকার আছে। কিন্তু তাকে সেই সুযোগ দেয়া হয়নি। এই ধরনের গণভোট কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ফলে আমরা এই গণভোটের প্রক্রিয়ার সাথে একমত হতে পারিনি। আমরা চাই রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংস্কার হউক। কিন্তু ঐকমত্য কমিশন যে প্রক্রিয়ায় এ ব্যাপারে এগিয়েছেন, সেটাকে মেনে নেয়া যায় না।

এক নতুন নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে দেশ গড়ে তুলতে হবে

প্রচুর আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক গণঅভ্যুত্থান পরবর্তীতে হয়েছে, এখনও হচ্ছে। এখনও অনেক মানুষ আছেন, যারা সত্যিকার অর্থেই একটা পরিবর্তন চান। রাজনীতিতে যে দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, লুটপাট ও ক্ষমতার দাপট দেখানোর যে সংস্কৃতি চালু হয়েছে তার অবসান চান। আমাদের দল তাদের সামনে এই পুঁজিপতি-শিল্পপতি শ্রেণির সহায়ক রাজনৈতিক দলগুলোর নৈতিকতা ও মূল্যবোধহীন অসার এবং স্বার্থপর রাজনীতিকে উন্মোচন করার চেষ্টা করেছে। এর পরিবর্তে সমাজতন্ত্রের উচ্চ মূল্যবোধ ও হৃদয়বৃত্তির রাজনীতিকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী বলেছিলেন- রাজনীতি হলো একটি মহৎ কর্মপ্রয়াস যার লক্ষ্য সমাজ হতে অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ ও নির্যাতনের অবসান ঘটানো। আমাদেরকে আজ মওলানা ভাসানীসহ বিভিন্ন মনীষীদের জীবন ও সংগ্রামকে সামনে আনতে হবে। একটা নতুন চরিত্র গড়ে তোলার সংগ্রাম সূচনা করতে হবে।

আমাদের প্রার্থীদের প্রচারে যুক্ত হয়ে ও আমাদেরকে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করুন

অন্যান্য দলগুলো শিল্পপতি, বড় ব্যবসায়ী, ব্যাংক লুটপাটকারীদের টাকা নিয়ে লড়ে। এই নির্বাচনকে ঘিরে যে প্রচার এতদিন ধরে চলছে, তা দেখেও আপনারা বুঝতে পারছেন যে, কী পরিমাণ অর্থ নিয়ে বড় বড় দলগুলো নির্বাচনে নেমেছে। বড় বড় মিডিয়াও তাদেরই প্রচার দিচ্ছে। এটাই চলবে ভোট পর্যন্ত। এই দলগুলো অর্থের শক্তি, পেশিশক্তি ও মিডিয়ার শক্তি দিয়ে নির্বাচনে লড়ে। আর এর বিপরীতে আমাদের দলের শক্তির উৎস হলো দলের আদর্শ, উন্নত নৈতিক বল এবং সাধারণ জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও ভালোবাসা। এই বিশ্বাস নিয়েই আমরা নির্বাচনে লড়ছি।

আমরা মনে করি, গণঅভ্যুত্থান পরবর্তীতে একটা পরিবর্তন এসেছে বাংলাদেশের জনগণ ও ছাত্র-যুবক-তরুণদের মনে। তারা পথ খুঁজছেন। আমরা বিশ্বাস করি, এই তরুণ-যুবকরা অর্থের বিনিময়ে নিজের বিবেককে বিক্রি করবেন না। আত্মমর্যাদা ও মনুষ্যত্ব নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবেন, যেমন দাঁড়িয়েছিলেন গণঅভ্যুত্থানে। আমরা এই লড়াইয়ের ঝাণ্ডাই বহন করে চলেছি। আমরা আপনাদের কাছে আবেদন রাখছি- আমাদের দলকে শক্তিশালী করুন, নির্বাচনেও আমাদের সমর্থন করুন।

(ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাসদ (মার্কসবাদী)'র ইশতেহার থেকে রাজনৈতিক অংশটি এখানে মুদ্রিত হলো)

সাম্যবাদ
১৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা, মার্চ-২০২৬

১ম পৃষ্ঠার পর

ইরান হামলার প্রকৃত কারণ

এই হামলার উদ্দেশ্য হলো মধ্যপ্রাচ্যে শক্তির ভারসাম্য পুনর্গঠন এবং তেলসম্পদ ও কৌশলগত রুটের উপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর প্রকল্পের অংশ।

মধ্যপ্রাচ্যকে বলা যায় পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার জ্বালানি হৃদপিণ্ড। বিশ্বের বৃহৎ তেল ও গ্যাস মজুদের উল্লেখযোগ্য অংশ এই অঞ্চলে অবস্থিত। শিল্পায়িত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর অর্থনীতি, সামরিক শক্তি এবং প্রযুক্তিগত আধিপত্য এই জ্বালানি প্রবাহের উপর নির্ভরশীল। ফলে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ন্ত্রণ মানে বিশ্ব অর্থনীতির উপর প্রভাব বিস্তার।

এই বাস্তবতার কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে অঞ্চলটি ক্রমাগত সামরিক হস্তক্ষেপ, অভ্যুত্থান, প্রক্সি যুদ্ধের পরীক্ষাগারে পরিণত হয়েছে। ইরান সেই ভূরাজনৈতিক দাবা খেলায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘুঁটি। পারস্য উপসাগর, হরমুজ প্রণালী এবং আঞ্চলিক শক্তি ভারসাম্যে ইরানের অবস্থান এমন যে, তাকে নিয়ন্ত্রণ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

১৯৫৩ থেকে বর্তমান: হস্তক্ষেপের ধারাবাহিকতা

ইরানের বিরুদ্ধে বর্তমান সামরিক আগ্রাসনের প্রকৃত চরিত্র বুঝতে হলে ইতিহাসের গভীরে ফিরে যেতে হবে – বিশেষ করে ১৯৫৩ সালের সেই ঘটনাটির দিকে, যা শুধু একটি সরকার পরিবর্তনের ঘটনা ছিল না; বরং মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের আধুনিক মডেল প্রতিষ্ঠার সূচনা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ইরান ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র, কিন্তু বাস্তবে তার অর্থনীতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল পশ্চিমা কর্পোরেট শক্তির হাতে। বিশেষ করে ইরানের তেলসম্পদ প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো ব্রিটিশ মালিকানাধীন Anglo-Iranian Oil Company এর মাধ্যমে, যা পরবর্তীতে BP নামে পরিচিত হয়। ইরানের মাটির নিচের বিপুল সম্পদ থেকে যে মুনাফা অর্জিত হতো, তার সামান্য অংশই ইরানের জনগণের কাছে পৌঁছাত। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটে। ১৯৫১ সালে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী Mohammad Mosaddegh একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন – ইরানের তেলশিল্প জাতীয়করণ।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত পশ্চিমা শক্তির অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থে সরাসরি আঘাত হানে। ব্রিটেন প্রথমে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে, ইরানি তেল বয়কট শুরু করে এবং আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করে। যখন এসব পদক্ষেপেও মোসাদ্দেককে নত করা সম্ভব হয়নি, তখন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেওয়া হয়। ১৯৫৩ সালে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা Central Intelligence Agency এবং ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা MI6 যৌথভাবে পরিচালনা করে কুখ্যাত Operation Ajax। এই অভিযানের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে গণঅস্থিরতা সৃষ্টি, মিডিয়া প্রভাবিত করা, সামরিক কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়া এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা তৈরি করে মোসাদ্দেক সরকারকে উৎখাত করা হয়।

এরপর ক্ষমতায় পুনর্বহাল করা হয় শাহ Mohammad Reza Pahlavi–কে, যিনি পশ্চিমা শক্তির ঘনিষ্ঠ মিত্রে পরিণত হন। শাহের শাসনামলে ইরান দ্রুত সামরিকীকরণ ও পশ্চিমা পুঁজির জন্য উন্মুক্ত অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এই আধুনিকায়নের আড়ালে গড়ে ওঠে কঠোর দমনমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা। বিরোধী মত দমনে কুখ্যাত গোপন পুলিশ SAVAK গঠন করা হয়, যা হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীর উপর নির্যাতন চালায়। এই পর্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে একটি মৌলিক সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে–পশ্চিমা শক্তির কাছে গণতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; গুরুত্বপূর্ণ ছিল অনুগত শাসক এবং সম্পদের নিরাপদ প্রবাহ। একটি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে সমর্থন দেওয়াই সেই বাস্তবতার প্রমাণ।

এই দীর্ঘ দমননীতি এবং বিদেশি প্রভাবের বিরুদ্ধে জমে ওঠা ক্ষোভই শেষ পর্যন্ত ১৯৭৯ সালের Iranian Revolution–এর জন্ম দেয়। শাহের পতন ঘটে । শাহের পতনের পর কথিত ইসলামী বিপ্লবের নামে শাহের পতনের আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনকারী কমিউনিস্টদের উপর ব্যাপক দমন-পীড়ন, হত্যাযজ্ঞ শুরু করে নতুন সরকার। পরবর্তী সময়ে ইরান পশ্চিমা আধিপত্য থেকে বেরিয়ে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করলে তাকে দ্রুত 'শত্রু রাষ্ট্র' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এবং আঞ্চলিক চাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

পরবর্তী চার দশকে ইরানের বিরুদ্ধে নীতি প্রায় একই থেকেছে–অর্থনৈতিক অবরোধ, প্রযুক্তিগত নিষেধাজ্ঞা, সাইবার হামলা, গোপন সামরিক অভিযান এবং আঞ্চলিক ঘেরাও কৌশল। পারমাণবিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি করা হয়, যদিও আন্তর্জাতিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের প্রচেষ্টা বহুবার দেখা গেছে। তবুও নিষেধাজ্ঞা ও সামরিক চাপ কখনো পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হয়নি। এই ধারাবাহিকতা দেখায় যে সংঘাতের মূল প্রশ্ন আদর্শিক নয়; বরং ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন। যে রাষ্ট্র নিজস্ব সম্পদের উপর সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং বৈশ্বিক শক্তির প্রভাবের বাইরে নীতি অনুসরণ করে, তাকে বারবার চাপের মুখে ফেলা হয়।

যুদ্ধ কেন হয়?
লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্ব ও যুদ্ধের অনিবার্যতা

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা লেনিন দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদ তার বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো বিশ্বজুড়ে তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার দখল ও ভাগবাটোয়ারাকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় এবং একে কেন্দ্র করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সাম্রাজ্যবাদ যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন যুদ্ধের সম্ভাবনাও টিকে থাকবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বজুড়ে বাজার সংকট আরো তীব্র হয়েছে। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশই আজ ব্যাপক অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছে। উৎপাদনের পরিমাণে ঘাটতি না থাকলেও কেনার ক্ষমতা নেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের। ফলে সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য দেশগুলো অর্থনীতির সামরিকীকরণের পথে যাচ্ছে। এযুগের অন্যতম মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, "এই শিল্পের সামরিকীকরণ বলতে কি বোঝায়? শিল্পের সামরিকীকরণ বলতে বোঝায়, সরকার যেখানে নিজেই অর্ডার দেয়, আবার সেই তৈরী মাল সরকার নিজেই কেনে। উৎপাদিত মাল বিক্রীর জন্য বাজারের উপর, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হয় না। শুধু সামরিক খাতে সরকারের বাজেট বাড়তে থাকে। ফলে, মন্দা অর্থাৎ, যাকে আমরা বলি বাজার নেই, কাজকর্ম নেই, অর্ডার নেই এই সমস্যার হাত থেকে সাময়িকভাবে হলেও শিল্পগুলো বাঁচে। অবস্থাটা দাঁড়ায় এইরকম যে, সরকার নিজেই 'প্লেন' তৈরী করার, 'ফাইটার' তৈরী করার এবং নানারকম সামরিক সরঞ্জাম তৈরী করার অর্ডার দেয়, আবার ঐ তৈরী মালগুলি সরকারই কেনে। ফলে, বাজারের উপর বা লোকের ক্রয়ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হয় না বলে সাময়িকভাবে 'রিসেশন' বা বাজার-মন্দার চাপ থেকে অর্থনীতিকে কিছুটা পরিমাণে রক্ষা করা সম্ভব হয়। কিন্তু, এই পরিকল্পনার আবার একটা কনট্র্যাডিকশন বা উল্টোদিক আছে। তা হল এই যে, যত মাল বা অস্ত্রশস্ত্র তৈরী হতে থাকবে সেগুলো যদি বসে থাকে, অর্থাৎ সেগুলো যদি খালাস করা না যায়, তাহলে মাল ক্রমাগত জমতে থাকার ফলে অর্থনীতিতে বন্ধ্যাত্বের ঝোঁক (টেন্ডেনসি অব স্ট্যাগনেশন)-এর জন্ম হবে এবং এর ফলে সামরিক শিল্পেও আবার লালবাতি জ্বলতে শুরু করবে। অথচ, সরকারও বিনা প্রয়োজনে ক্রমাগত এই মালগুলো কিনে গুদামজাত করতে পারে না। কাজেই এই মাল খালাস করার প্রয়োজনেই তাদের চাই স্থানীয় এবং আংশিক যুদ্ধ। এই মূল অর্থনৈতিক বুনিয়াদ থেকেই একের পর এক যে সঙ্কট সৃষ্টি করে চলেছে তার থেকেই তার বর্তমান যুদ্ধনীতির উদ্ভব হয়েছে।"

যুদ্ধ অর্থনীতি ও অস্ত্রশিল্প: সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির অদৃশ্য চালিকাশক্তি

বিশ্ব অস্ত্রবাজারের দিকে তাকালে দেখা যায়, সামরিক ব্যয় বিগত দুই দশকে নজিরবিহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা Stockholm International Peace Research Institute–এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বৈশ্বিক সামরিক ব্যয় প্রথমবারের মতো ২.৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। অর্থাৎ মানবসভ্যতা শিক্ষা, স্বাস্থ্য কিংবা জলবায়ু সংকট মোকাবিলার চেয়ে বহু গুণ বেশি অর্থ ব্যয় করছে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে। এই ব্যয়ের প্রায় ৪০ শতাংশ একাই বহন করে যুক্তরাষ্ট্র।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় শিল্প অর্থনীতির একটি কেন্দ্রীয় স্তম্ভ। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বাজেট প্রায় ৮৭০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়–যা পরবর্তী দশটি দেশের সম্মিলিত সামরিক ব্যয়ের কাছাকাছি। এই বিপুল অর্থ সরাসরি প্রবাহিত হয় বেসরকারি অস্ত্র নির্মাতা কর্পোরেশনগুলোর কাছে। বিশ্বের বৃহত্তম অস্ত্র প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করে আছে মার্কিন কোম্পানিগুলো, যেমন–Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics।

শুধু Lockheed Martin একাই বছরে ৬৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি করে। তাদের তৈরি F-35 যুদ্ধবিমান কর্মসূচি ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল অস্ত্র প্রকল্প, যার মোট ব্যয় ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে।

যখন কোনো অঞ্চলে সংঘাত শুরু হয়, তখন অস্ত্রের চাহিদা হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। মধ্যপ্রাচ্য এই বাজারের সবচেয়ে বড় ক্রেতা অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার এবং ইসরায়েল–সবাই যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ অস্ত্র ক্রেতা। SIPRI-এর তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ব অস্ত্র রপ্তানির প্রায় ৪০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে যুক্তরাষ্ট্র। এর বড় অংশ যায় মধ্যপ্রাচ্যে। অর্থাৎ আঞ্চলিক উত্তেজনা যত বাড়ে, অস্ত্র বিক্রিও তত বৃদ্ধি পায়। এই বাস্তবতায় যুদ্ধ কখনো সম্পূর্ণভাবে সমাধান হয়ে গেলে অস্ত্রবাজার সংকুচিত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। ফলে স্থায়ী শান্তির পরিবর্তে "নিয়ন্ত্রিত অস্থিরতা" অনেক সময় অর্থনৈতিকভাবে বেশি লাভজনক হয়ে ওঠে।

ইরানে আমেরিকার হামলা কী 'গণতন্ত্র' আনবে?

ইরানের জনগণের মুক্তি, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কিংবা স্বৈরাচারের অবসান – এই সব শব্দগুচ্ছ সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত প্রচারযন্ত্রে যতটা উচ্চারিত হয়, বাস্তবতা তা নয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সাম্রাজ্যবাদ কখনো জনগণের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে না; বরং জনগণের উপর তার অনুগত শাসন কাঠামো চাপিয়ে দেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় প্রতিটি সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে একই নৈতিক ভাষা ব্যবহার করেছে–ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া কিংবা সিরিয়া। প্রতিবারই বলা হয়েছে জনগণকে মুক্ত করা হবে, স্বৈরাচার দূর হবে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু বাস্তব ফলাফল কী? রাষ্ট্র ভেঙে পড়েছে, গৃহযুদ্ধ বিস্তার লাভ করেছে, উগ্রবাদী শক্তির উত্থান ঘটেছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে সৃষ্টি হয়েছে অস্থিতিশীলতা, যা বহিরাগত শক্তির দীর্ঘমেয়াদি সামরিক উপস্থিতিকে বৈধতা দিয়েছে। ইরানের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। অথচ একটি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের অধিকার সেই দেশের জনগণেরই। আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের মৌলিক নীতিই এটি স্বীকার করে।

প্রতিরোধের প্রশ্ন ঃ জনগণের মুক্তি কার হাতে?

ইরানে প্রবল ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী শাসন চালু আছে। জনগণের মধ্যে তার বিরুদ্ধে ক্ষোভও আছে। তাই বলে আমেরিকার আগ্রাসন সমর্থন করা যায় না। ইরানের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, দমননীতি – এসব প্রশ্ন ইরানের জনগণ নিজেরাই তুলছে এবং তার বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম চলমান। যারা একইসাথে ইরানের সরকারের ও আমেরিকার আগ্রাসনের বিরোধিতা করছে, বামপন্থী সেই শক্তিগুলোর উপর আমেরিকা হামলা করছে। একটি দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার কেবল সেই দেশের জনগণেরই। ইতিহাস দেখিয়েছে, বিদেশি আগ্রাসন কখনো জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করে না; বরং রাষ্ট্রীয় দমনকে বৈধতা দেয় এবং জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধকে উসকে দেয়। বাহ্যিক হামলা জনগণের স্বাধীন সংগ্রামকে দুর্বল করে, কারণ তখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজেকে 'জাতীয় প্রতিরক্ষা' র নামে আরও কেন্দ্রীভূত করতে পারে।

লেনিনের সতর্কবাণী আজও প্রাসঙ্গিক – যতদিন সাম্রাজ্যবাদ থাকবে, ততদিন যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকবে। এই বাস্তবতায় বিশ্বের শান্তিকামী জনগণের সামনে প্রশ্ন দাঁড়ায় – যুদ্ধ কি অনিবার্য নিয়তি, নাকি সংগঠিত প্রতিরোধের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব? ইতিহাস দেখায়, ভিয়েতনাম থেকে লাতিন আমেরিকা পর্যন্ত জনগণের প্রতিরোধ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে। আন্তর্জাতিক সংহতি, গণআন্দোলন এবং রাজনৈতিক সচেতনতা যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে। সেই লক্ষ্যে বিশ্বের শ্রমজীবী, শান্তিকামী ও গণতন্ত্রপ্রত্যাশী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

সাম্যবাদ

১৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা, মার্চ-২০২৬

সাম্যবাদ-এর ফেসবুক পেইজ ফলো করতে স্ক্যান করুন

আমেরিকার সাথে ড: ইউনুস সম্পাদিত দেশবিরোধী চুক্তি বাতিল কর

গত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঠিক দুইদিন আগে দেশের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন কালো চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ডক্টর ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। আমেরিকার সাথে সম্পাদিত 'এগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্রেড' বা পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, অর্থনীতি, কৃষি, বাণিজ্য, পররাষ্ট্রনীতিকে হুমকির মধ্যে ফেলা হয়েছে। ইউনুস সরকার তড়িঘড়ি করে এবং কঠোর গোপনীয়তার সাথে এই চুক্তি সম্পাদন করে।

২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার বাণিজ্য যুদ্ধের অংশ হিসেবে বাংলাদেশী সকল পণ্যের ওপর ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন, এর আগ পর্যন্ত যা গড়ে ১৫ শতাংশ ছিল। নতুন এই শুল্ক আরোপের ফলে পোশাক রপ্তানি ব্যবসায়ীদের মধ্য শঙ্কা সৃষ্টি হয়। এরপর থেকেই সরকার এবং ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার স্বার্থে যেকোন মূল্যে আমেরিকার সাথে সমঝোতায় যেতে চায়। ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে দেন-দরবার করে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নির্বাচনের আগ মুহূর্তে চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

এই নতুন চুক্তির ফলে আমেরিকা তার শুল্ক কমিয়ে ১৯ শতাংশ করেছে, কিন্তু বিনিময়ে দীর্ঘস্থায়ীভাবে বাংলাদেশকে নানা শর্তে জিম্মি করার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশ এ ব্যাপারে তার সম্মতিও দিয়ে এসেছে।

এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী -

১. বাংলাদেশকে আমেরিকার কাছ থেকে আরও বেশি সামরিক সরঞ্জাম কিনতে হবে। অন্য দেশ (যেমন- চীন, রাশিয়া) থেকে সামরিক সরঞ্জাম কেনা কমাতে হবে।

২. আমেরিকার জন্য ঝুকিপূর্ণ কোন দেশ থেকে নতুন করে পারমাণবিক চুল্লী, জ্বালানি ইত্যাদি কেনা যাবে না। বাংলাদেশ চীন, রাশিয়ার মত দেশের সঙ্গে কোন অর্থনৈতিক চুক্তি করলে আমেরিকা এই চুক্তি বাতিল করে শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করবে।

৩. আমেরিকা যদি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সীমান্ত বা বাণিজ্যিক পদক্ষেপ নেয় তাহলে বাংলাদেশকেও 'পরিপূরক বিধিনিষেধ' আরোপ করতে হবে।

৪. চুক্তির শর্তানুযায়ী বাংলাদেশকে ১৫ বিলিয়ন ডলারের জ্বালানি (এলএনজি), ১৫টি বোয়িং বিমান, প্রতিবছর ৩.৫ বিলিয়ন ডলারের কৃষি পণ্য (গম, সয়াবিন, গরু মাংস ইত্যাদি) কিনতে হবে। আমেরিকার প্রায় ৪৪০০ টি পণ্য বিনাশুল্কে আমদানি করতে দিতে হবে। এভাবে কয়েক লক্ষ কোটি টাকার পণ্য কেনার বাধ্যবাধকতা তৈরি করেছে। যা দেশের ওপর নতুন করে বৈদেশিক ঋণের বোঝা বাড়াবে।

৫. বাংলাদেশকে বন্দর, টার্মিনাল ও জাহাজ পরিচালনায় এমন ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে যেন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন দেশ তথ্য না পায়। মার্কিন পণ্য যাতে অন্য দেশে রপ্তানি না হয় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাণিজ্য পর্যবেক্ষণের জন্য কাস্টমস লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য স্ক্রিন শেয়ার করতে হবে। এধরনের শর্ত দেশের অর্থনীতির উপর মার্কিন নজরদারি বৃদ্ধি করবে।

৬. যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসা সামগ্রী, ঔষধ, কৃষিপণ্য দেশে কোন পরীক্ষা ছাড়াই আমদানির অনুমতি দিতে হবে। যা দেশের নিরাপত্তা ও মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়াবে।

উপরোক্ত শর্তগুলো

● এরপর ৩য় পৃষ্ঠায়

আমি কেন বাসদ (মার্কসবাদী) প্রার্থী সাদিয়া নোশিন কে সমর্থন করি –জিনবিজ্ঞানী ড. আবেদ চৌধুরী

ড. আবেদ চৌধুরী কাঁচি প্রতিক তুলে দিচ্ছেন সাদিয়া নোশিন তাসনিম এর হাতে

সাদিয়া নোশিন তাসনিম চৌধুরীকে মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) সংসদীয় আসনে নির্বাচনের জন্য আমি সমর্থন করছি। আপনারা তাঁকে কাঁচি মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। কয়েকটি কারণে আমি তাঁকে সমর্থন করি-

প্রথমত: সে আমার সন্তান সমতুল্য। অতএব, জীবনের রিলে দৌঁড়ে আমার হাতের বেটন তাঁরই প্রাপ্য। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, পুরনো প্রজন্ম নতুনকে নেতৃত্বে আহ্বান জানাবে। একই সাথে পথ দেখাবে ও অনুসারী হবে- যাতে নতুনরা আত্মবিশ্বাসের সাথে নেতৃত্ব দিতে পারে। আমি নোশিনকে সমর্থন করি কারণ সে একজন নারী। বর্তমান রাজনীতিতে দলগুলোর নারী বিমুখতা দেখে আমি বিষন্ন, হতচকিত ও গ্লানিতে পূর্ণ। নোশিনকে সমর্থন করার মাধ্যমে কিছুটা হলেও এই গ্লানি থেকে মুক্তি পাচ্ছি। নোশিনকে সমর্থন করি কারণ সে সমাজতন্ত্রী ও শোষিতের বন্ধু। শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বে আমি নোশিনের পক্ষে থাকতে চাই। কারণ আমি গরীব মেহনতি মানুষের পক্ষ কখনো ছাড়বো না। আমি সাদিয়া নোশিনকে দেখি আগামীর এক উজ্জ্বল দিনের প্রতিনিধি হিসেবে। সে ও তাঁর প্রজন্ম অবশ্যই আমাদের স্বপ্নের সোনালী ভবিষ্যতকে ধারণ করবে এবং নির্মাণের সংগ্রাম জারি রাখবে। আমি তাঁকে সমর্থন করি; কারণ তাঁর সাথে রয়েছে অনাগত দিনের প্রতিশ্রুতি, আগামী বিজয়ের লাল পতাকা। অতীতমুখী রক্ষণশীলতার বিপরীতে সে ধারণ করছে অসাম্প্রদায়িকতা, অকপট-সাহসী-তারুণ্যমিশ্রিত নারীত্ব ও গঠনতান্ত্রিক প্রগতিশীলতা।

আসুন, সবাই মিলে বাংলাদেশের রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সাদিয়া নোশিন তাসনিম চৌধুরী'র নির্বাচনী লড়াইয়ে শামিল হই। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইং তারিখে কুলাউড়া উপজেলার ডাক বাংলা মাঠে বিকেল ৩ টায় আয়োজিত 'কাঁচি মার্কা'র নির্বাচনী জনসভায় স্ব-উদ্যোগে দলে দলে যোগদান করি। মৌলভীবাজার-২ এর বাকি প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি রইল অভিনন্দন ও শুভ কামনা।

শ্রীলংকার ফ্রন্টলাইন সোশ্যালিস্ট পার্টির আমন্ত্রণে কনভেনশনে যোগদান

শ্রীলংকার ফ্রন্টলাইন সোশ্যালিস্ট পার্টির আমন্ত্রণে তাদের ৪র্থ পার্টি কনভেনশনে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য ডা. জয়দীপ ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী সমাবেশে জার্মান, যুক্তরাজ্য, ইতালি, ভারতসহ বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সাথে বক্তব্য রাখেন কমরেড জয়দীপ ভট্টাচার্য। তিনি যুদ্ধোন্মত্ত সাম্রাজ্যবাদীদের ধ্বংসলীলা থেকে মানবসভ্যতাকে রক্ষায় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ঐক্য ও লড়াই গড়ে তোলার আহবান জানান। বাংলাদেশের জনগণের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের পক্ষ থেকে উপস্থিত কমরেডদের শুভেচ্ছা জানান।

নরসিংদীতে কিশোরীকে ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নারীমুক্তির বিক্ষোভ

নরসিংদীতে কিশোরীকে ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার ও সারাদেশে অব্যাহত নারী-শিশু নির্যাতন-ধর্ষণের দ্রুত বিচার নিশ্চিতের দাবিতে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ২৮ ফেব্রুয়ারী'২৬ বেলা ১১.৩০ টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সীমা দত্তের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পীর পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আসমা আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক তাসলিমা আক্তার বিউটি, প্রচার প্রকাশনা সম্পাদক সুস্মিতা রায় সুপ্তি প্রমুখ। একই দাবিতে চট্টগ্রামে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গত ৩ মার্চ নারী মুক্তি কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ নরসিংদীদে হত্যাকাণ্ডের শিকার পরিবার ও গ্রামবাসির সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ শেষে জেলা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ে আসামীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান।

ইরানে মার্কিন ও ইসরায়েল হামলার প্রতিবাদে মশাল মিছিল

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ (শনিবার) সন্ধ্যা ৬:৩০ টায় ইরানে মার্কিন ও ইসরায়েলের যৌথ সামরিক আক্রমণের প্রতিবাদে বাসদ (মার্কসবাদী)-এর মশাল মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মশাল মিছিলটি তোপখানা রোডে অবস্থিত দলের কেন্দ্রীয় অফিস থেকে শুরু হয়ে পুরানা পল্টন, নুর হোসেন চত্বর, বায়তুল মোকাররম মার্কেট, প্রেসক্লাব মোড় প্রদক্ষিণ করে পল্টন মোড়ে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশটি সঞ্চালনা করেন বাসদ (মার্কসবাদী) দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য কমরেড রাশেদ শাহরিয়ার, বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য কমরেড সীমা দত্ত এবং সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা। একই দাবিতে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সম্পাদক : জয়দীপ ভট্টাচার্য, 'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর পক্ষে মো: শফি উদ্দিন কবির কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন-০২-২২৩৩৫৬৩৭৩, ০১৭১১-৪৪০২৬৫। website: www.spbm.org, E-mail: mail@spbm.org